



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 1073 - 1081

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

ফিরে দেখা বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকা : প্রসঙ্গ স্বদেশপ্রেম

ড. বাসুদেব সরকার

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

রামপুরহাট কলেজ, রামপুরহাট, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

Email ID: basadeb9434mld@gmail.com

 0009-0001-9823-7852

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

East and West,
Renaissance,
modernity, mantra
of freedom,
patriotism,
rationalism, Vande
Mataram, self-
awakening, essay
literature,
Bangadarshan.

Abstract

Bankim Chandra Chattopadhyay, the literary emperor of Bengali literature, was the brightest star in the nineteenth-century Renaissance. His primary aim was to awaken love for the motherland through socially beneficial literature. Influenced by eminent thinkers and literary figures from East and West, Bankim Chandra presented *Bangadarshan* to the people in 1872, aiming to awaken the self-consciousness of the Bengali nation. *Bangadarshan* helped construct the self-identity of a distinct Bengali nation whilst removing the disgrace attached to the Bengali language. The motives behind *Bangadarshan*'s publication were manifold. Through it, a powerful literary group emerged. One notable achievement was the creation of a refined readership cutting across distinctions of rich and poor, high and low. A rich and developed literary language was shaped on its pages. It inspired the historically indifferent Bengali nation to engage anew in the study of history. The journal served as a field not only for literature but also for the study of Eastern and Western religion, culture, philosophy, science, and history. In Bankim Chandra's editorial vision, there was no real conflict between literature and religious consciousness. In his view, love for country and love for humanity were identical. The principal driving force behind *Bangadarshan*'s activities was patriotism. His concept of patriotism was shaped by works such as Hemchandra Bandyopadhyay's *Birbahu Kavya*, Rangalal Bandyopadhyay's *Padmini Upakhyan*, Dinabandhu Mitra's play *Nil Darpan*, and the patriotic tradition in the Tagore household. He was also influenced by contemporary global events and individual figures. Through his essay collections—*Kamalakanta's Daptar*, *Bangadesher Krishak*, *Samya*, *Krishnucharitra*, and others—Bankim Chandra discussed the responsibility owed to the motherland. Along with literary aesthetic pleasure, he introduced information, theory, and rationalism into *Bangadarshan*. The mantra "Vande Mataram", marking the beginning of Indian nationalism, was first articulated in the novel *Anandamath* on *Bangadarshan*'s pages. As a historical document of the expanding self-awareness of the Bengali nation, this mantra inspired the Bengali people, its ultimate outcome being India's independence. Yet a

question remains: whilst Bankim Chandra fulfilled his responsibility in such a manner, to what extent have we, the people of his country, been able to walk properly along that path? The present article discusses and analyses these issues critically.

Discussion

স্বাধীনতার ৭৭ বছর পার করে ফিরে দেখার সময় এসেছে, কী করে দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে সমকালে জাগিয়ে তুলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সেদিন দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবাদের আগুন জ্বালিয়ে তোলাটা খুব অল্প কথা ছিল না — এই প্রসঙ্গে জাতীয়তাবাদের মহামন্ত্রের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর দেশপ্রেম সংক্রান্ত আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আমাদের আধমরা প্রাণে ঘা মেরে জাগাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন উনিশ শতকের রেনেসাঁর জাতকেরা। এই উদ্দেশ্যে প্রাচীন ঐতিহ্য, ধর্ম, সংস্কারের পুনরানুসন্ধান ও পুনর্বিচার চলেছিল। পৃথিবীর ইতিহাস চর্চার মধ্যে দিয়ে, বহির্বিশ্বের জ্ঞানের সঙ্গে সেতু বন্ধনের প্রয়াসও চলেছিল। উনিশ শতকের রেনেসাঁর প্রথম পুরুষ রামমোহন রায় ও তাঁর অনুগামী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, তত্ত্ববোধিনী সভা, ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়, রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্রের কার্যকলাপ, ঈশ্বর গুপ্তের পত্রিকা গোষ্ঠী, মাইকেল মধুসূদনের সাহিত্য রচনা, বিভিন্ন ধর্মীয় আন্দোলন, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনার ঘনঘটায় নড়েচড়ে উঠেছিল দেশ ও দেশের মানুষ। এইরকম পটভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। খুলনায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকা কালে ১৮৬১-তে ইংরাজি ভাষায় লিখেছিলেন 'Rajmohan's Wife' — যে গ্রন্থটি ১৮৬৪ সালে কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। শিক্ষিতের বাহন 'ইংরাজি' এবং 'বাংলা' মেছুনিদের ভাষা — বঙ্কিমচন্দ্রের মনকেও আচ্ছন্ন করেছিল এরকমই একটা সন্ধিগ্ধ ভাব। কিন্তু দেশকালের এই জেগে ওঠা তাঁকে স্পর্শ করেছিল ফলে 'বাংলা' এবং 'ইংরাজি'-র দ্বিধা ধীরে ধীরে মিটে গিয়ে 'বাংলা' সুয়োরানীর স্থান পেল এবং বঙ্কিমচন্দ্র দৃঢ় প্রত্যয়ে স্থির করলেন —

“বাঙ্গলার ইতিহাস চাই, না হলে বাঙ্গলার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে।”

বহুদিন আগে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বুঝেছিলেন বঙ্গ ভাঙারে 'রতন' আছে। 'রতন' থাকলে কী হবে? রত্নকে খনি থেকে তোলার কঠিন কাজ কে করবে? রত্নের সঠিক ব্যবহারই বা কে জানে? তবে হ্যাঁ এই কাজে ব্রতী হয়েছিলেন উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ মণীষা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সৃষ্ট 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মাধ্যমে। কল্যাণমূলক সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে দক্ষ সম্পাদকের ভূমিকা পালন করে বাঙালি জাতিকে উঠে দাঁড়াবার শক্তি ও সাহস দেখিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রতিভাশালী কোনো ব্যক্তিত্ব যখন পত্রিকা সম্পাদনা করেন তখন সেই সময়কার যুগমানস এবং সমাজমানস বিশেষ চেহায়ায় ও নকশায় ধরা দেয়। বাংলা সাহিত্যে মাতৃভাষার মাধ্যমেই উচ্চশ্রেণি ও নিম্নশ্রেণির ভেদাভেদ ঘোঁচাতে চেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'বঙ্গদর্শন'-এর মাধ্যমে বার্তা দিয়েছিলেন জাতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মেরুদণ্ড গড়ে তোলার জন্য। তিনি বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তার স্রষ্টা বলে নন্দিত, আবার একই কালে ঐতিহ্য সংস্কারে বন্ধ রক্ষণশীল বলেও নন্দিত। অবশ্য পরবর্তীকালে বাঙালি সমাজের অনেক আদর্শ ও চিন্তার সূত্রপাত তাঁরই হাতে — এ কথা অনস্বীকার্য। বাঙালির জাতীয়চেতনা পরবর্তী পর্যায়ে ভারতচেতনা বা বিশ্বচেতনায় রূপান্তরিত হয়েছিল। যুক্তিবাদী সংস্কারমূলক ব্যাখ্যা দ্বারা উদার মানবধর্মের পথও তিনিই প্রস্তুত করেছিলেন — এ সবকিছুর মূলে ছিল 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমগ্র সাহিত্য কর্মে স্বদেশপ্ৰীতি বর্ধিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে 'বঙ্গদর্শন' কেন্দ্রিক রচনাগুলিতে। খ্যাতিমান কয়েকজন সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তীকালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেও বর্তমান প্রবন্ধের মূল সম্পাতবিন্দু শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনার কালপর্ব।

বাংলা সাহিত্যে এক নতুন যুগের সূচনা হল এই 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মাধ্যমে। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালি জাতির মনে আনলেন পরিবর্তনের চেউ। সেদিন বালক রবীন্দ্রনাথ সেই পরিবর্তন উপলব্ধি করে বলেছিলেন —

“তার আগে বাংলা ভাষায় গদ্যপ্রবন্ধ ছিল ইঙ্কলে পোড়োদের উপদেশের বাহন। বঙ্কিমের আগে শিক্ষিত সমাজ নিশ্চিত স্থির করেছিলেন যে তাঁদের ভাবসভোগের ও সত্যসন্ধানের উপকরণ একান্ত ভাবেই যুরোপীয় সাহিত্য হতেই সংগ্রহ করা সম্ভব, কেবল অল্পশিক্ষিতদের ধাত্রীবৃত্তি করবার জন্যই দরিদ্র বাংলাভাষার যোগ্যতা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী শিক্ষার পরিণত শক্তিকেই রূপ দিতে প্রবৃত্ত হলেন বাংলাভাষায় বঙ্গদর্শন মাসিকপত্রে। বস্তুত নবযুগপ্রবর্তক প্রতিভাবানের সাধনায় ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে বাংলাদেশেই যুরোপীয় সংস্কৃতির ফসল ভাবীকালের প্রত্যাশা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, বিদেশ থেকে আনীত পণ্য আকারে নয়, স্বদেশের ভূমিতে উৎপন্ন শস্যসম্পদের মতো।”^২

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিম যুগের সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম, সামাজিক আদর্শ ও দেশপ্ৰীতি নতুন রূপে ধরা দিল। ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকা একটি অসামান্য দীপ্ত প্রতিভাকে আশ্রয় করে সমগ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আলো বিচ্ছুরিত করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র আকর্ষণ ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেও সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। এই ‘শিক্ষা’-র মহত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না, কিন্তু উৎকর্ষিত ছিলেন ‘শিক্ষা’-কে কেমন করে বাঙালি জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায় — বিষয়টি নিয়ে। আধুনিক শিক্ষার ফলকে তিনি বাংলা ভাষায় নিবন্ধ করে বাঙালির সর্বজনলভ্য সম্পদে পরিণত করতে চাইলেন এই পত্রিকার মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ ‘বঙ্গদর্শন’ সম্পর্কে বলেছেন —

“...সাহিত্য যে আমাদের আপনাদের হইতে পারে, বিদেশী মাস্টারের শাসন হইতে ছুটি পাইয়া ঘরের দিকে ফিরিয়াছিলাম।”^৩

প্রকৃতপক্ষে ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের ‘ভারত কলঙ্ক’ ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রবন্ধ আমাদের প্রগাঢ় দেশপ্ৰীতির সিংহদ্বার খুলে দিয়েছিল। যার শুরু হয়েছিল ‘মুণালিনী’ দিয়ে এবং যার পরিণতি ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে।

বহুদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র বহুবিচিত্র বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধিতে — গদ্যভাষার পূর্ণতা, ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে স্বদেশের অঙ্গীভূত করে তোলার একক দায়িত্ব, স্বদেশীয় চেতনার নব উদ্বোধন, সৃষ্টিমূলক রসসাহিত্যের আদর্শ গঠন এবং যুক্তিবোধ আনয়ন ইত্যাদি বিষয়গুলির সম্পাদনের মাধ্যমে। ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকা প্রকাশের পর বাংলা সাহিত্য বাঙালি সংস্কৃতির নিজস্ব প্রকৃতিতে পরিণত হল। বাঙালির চিন্তা জাগরণের পত্রিকা বঙ্কিমচন্দ্রের আগে তেমন ছিল না। ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকা পূর্ণাঙ্গ জীবনতত্ত্বকে তুলে ধরেছিল, তার পূর্বে যে চিন্তাগত বিচ্ছিন্নতা ছিল এবং ভাবগত অপূর্ণতা ছিল ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকা তাকে ঐক্যসূত্রে গেঁথে দিল। এখান থেকে গড়ে উঠল আধুনিক জীবনের মূল্যবোধ। বঙ্কিমচন্দ্র দেশ ও জাতির কথা ভাবতে গিয়ে দেশপ্রেমকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর আগে দেশপ্রেমের ধারা খরস্রোতার মতো না বইলেও অগ্রজ বেশ কিছু লেখক-কবি-সাহিত্যিকদের লেখনীতে দেশপ্রেম প্রবাহমান ছিল। হেমচন্দ্রের ‘বীরবাহু’ কাব্য (১৮৬৪), ‘নীলদর্পণ’ (১৮৬০), ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ (১৮৫৮), ‘স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়’ — ইত্যাদি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনা সুস্পষ্ট করে তুলেছিল; নীলের হাঙ্গামাও তাঁকে বিচলিত করেছিল। সব মিলিয়ে দেশপ্রেমের সুগুণ বাসনা তাঁর অবচেতনে রূপ নিচ্ছিল।

সম-সাময়িক কালে বিশ্ব পটভূমিতে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনাও বঙ্কিমচন্দ্রকে স্পর্শ করেছিল —

১. কার্ল মার্কসের First International-এর আবির্ভাব (১৮৬৪-১৮৭৬)
২. রাশিয়ায় শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারার প্রসার।
৩. আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের অবসান।
৪. স্টুয়ার্ট মিলের Auguste Comte and Positivism-এর প্রকাশ।
৫. জনস্টুয়ার্ট মিলের The Subjection of Women গ্রন্থ প্রকাশ।
৬. ইতালিতে পোপতন্ত্রের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদীদের জয়লাভ।
৭. চার্লস ডারউইনের The Descent of Man and Selection in Relation to Sex-এর প্রকাশ।

উড়িয়ার দুর্ভিক্ষে দেশবাসীর দুর্দশা, হিন্দুমেলায় জাতীয় ভাবধারার উদ্বোধন, একই কালে ঠাকুরবাড়ির স্বদেশ চর্চা, রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা হীনতায়', মধুসূদনের 'মেঘনাদবধকাব্য', কেশবচন্দ্রের 'ব্রাহ্মদলের উন্মেষ', সাঁওতাল পরগণায় অরাজকতা ও ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ, বিদ্যাসাগরের 'বহুবিবাহ' পুস্তক প্রকাশ — স্বচক্ষে দেখছেন বঙ্কিমচন্দ্র। একই সময়ে স্যার গুরুদাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। ঠিক এই সময়ে বহরমপুরে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার পরিকল্পনা এবং ভাবনীপুর থেকে তার প্রকাশ। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার পথপ্রদর্শক ছিল বেশ কিছু পত্রিকা। বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর তাঁর সাহিত্য গুরু ঈশ্বর গুপ্ত এবং ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর'-এর প্রভাব সর্বজন জ্ঞাত। এছাড়া 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা তাঁর প্রেরণার উৎস বলা যেতে পারে। 'নীলদর্পণ'-এর মতো নাটক, পরবর্তীকালে ঐ নাটক National Theatre-এ (১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে) মঞ্চস্থ হওয়া, প্যারিচাঁদের মতো লেখকের অবস্থান বঙ্কিমচন্দ্র তথা 'বঙ্গদর্শন'-এর পালে হাওয়া দিয়েছিল একথা বললে অত্যুক্তি কিছু হবে না।

বঙ্কিমচন্দ্র কেন পত্রিকা সম্পাদনার কাজে নামলেন তার কৈফিয়ত মেলে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে। সমাজকে বেঁধে রাখার মাধ্যম সংবাদপত্র। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন'-এর আগে সেই রকম সংবাদপত্র বাংলায় ছিল না বললেই চলে। সংবাদপত্র সম্পাদনা করা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ — সম্পাদক একাধারে রাজার মন্ত্রী, প্রজার বন্ধু, সমাজের শিক্ষক। দক্ষ সম্পাদক হতে গেলে প্রয়োজন অসাধারণ বিদ্যা, বহুদর্ষিতা, গাভীর্য, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক — যা 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদকের ছিল। অতএব বঙ্কিম মাতৃভাষার উন্নতি সাধনকল্পে দেশ ও জাতির উন্নতির জন্য 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পরিকল্পনা করলেন এবং পত্রিকাটি প্রকাশের তিনটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করলেন —

১. পত্রিকাটিকে সুশিক্ষিত বাঙালির পাঠপোষোগী করতে যত্নশীল। হতে হবে।
২. কৃতবিদ্য সম্প্রদায় যেন তাঁদের 'বিদ্যা, কল্পনা, লিপি কৌশল ও চিত্তকর্ষের পরিচয়' দেন পত্রিকাটির মাধ্যমে।
৩. 'নব্য সম্প্রদায়' ও 'সাধারণ'-এর সহৃদয়তা স্থাপিত হয় যেন এই পত্রিকার মাধ্যমে।

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজদের চিন্তা ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও জাতি প্রতিষ্ঠার আইডিয়া। সেই আইডিয়াকেই সাহিত্যের অবয়বে রূপ দিলেন তাঁর প্রবন্ধ ও উপন্যাসে। বঙ্কিমচন্দ্র শুধুমাত্র একজন উপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, রস-রচনাকার বা সমালোচক ছিলেন না, ছিলেন সেকালের একজন অদ্বিতীয় সম্পাদক। তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' ছিল উনিশ শতকে বাংলা সাময়িকপত্রের 'ক্ল্যাসিক মডেল'। বাঙালির মন ও মননকে জাতীয়তাবোধে ও ঐতিহ্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাসকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা দানই ছিল 'বঙ্গদর্শন'-এর উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে হয় সত্যিই বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' বাঙালির হৃদয় লুঁঠ করে নিয়েছিল। ইতিমধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের তিনটি উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) এবং 'মৃগালিনী' (১৮৬৯) প্রকাশিত হয়ে গেছে — বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে কর্মরত। দীনবন্ধু মিত্র, গুরুদাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেন্ড লালবিহারী দে, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখের সাচহর্ষে একটি পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করলেন। যার বাস্তব রূপায়ণ ঘটল 'বঙ্গদর্শন'-এর (১৮৭২, ১২ই এপ্রিল, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ, ১লা বৈশাখ) মধ্যে দিয়ে। মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন ব্রজমাধব বসু। ১২৭৯-র বৈশাখ থেকে ১২৮২-র চৈত্র পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদিত হয়েছিল। ৪৮ মাসে ৪৮টি সংখ্যা এবং প্রতিটি ৪৮ পৃষ্ঠার। সমকালীন অন্যান্য পত্রিকার তুলনায় মহার্ঘ্য (৩ টাকা দাম)। ১২৮৩-তে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ পায়নি, ১২৮৪ থেকে তিনটি পর্বে আবার প্রকাশ পেতে থাকে। বঙ্কিম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় ১২৮৪ সাল থেকে, ১২৯০-এ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনার কাল-এই পর্বে পত্রিকার মান নেমে যায়। 'পশুপতি সম্বাদ' (চন্দ্রনাথ বসু রচিত) রচনাটি প্রকাশের পর বঙ্কিমচন্দ্র বন্ধ করে দেন পত্রিকাটি। ১৩০৮ থেকে ১৩১২ রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় পত্রিকাটি পুনরায় প্রকাশিত হতে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র পত্রিকার নাম দিয়েছিলেন 'বঙ্গদর্শন'। এই নামের মধ্যে আছে বঙ্কিমচন্দ্রের বহুদিনের চিন্তা ও ধ্যান। 'বঙ্গদর্শন' শুধু বাঙালির ভবিষ্যৎ আত্মানুসন্ধানের ক্ষেত্রে পরিণত হবে তা নয়, 'বঙ্গদর্শন' অতীত বাঙালির ভাবনা চিন্তাকে সামনে আনবে। এ প্রসঙ্গে 'বেঙ্গল স্পেকটেক্টর'-এর নাম করা যায়, কিন্তু তা 'বঙ্গদর্শন'-এর পরিপূরক ছিল না। 'বঙ্গদর্শন' বাঙালিকে সাময়িক উচ্ছ্বাসে ভেসে যেতে না দিয়ে স্থিরভাবে স্থায়ী মূল্যমানগুলিকে ভাবতে শিখিয়েছে। এই পত্রিকা প্রাচীনপন্থী ছিল না- — ইউরোপীয় দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্যতত্ত্ব নিয়েই 'বঙ্গদর্শন'-এর পরিক্রমা ক্ষেত্র। সাহিত্যের পাশাপাশি

রাষ্ট্রনীতি, দর্শন, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের লেখা ‘বঙ্গদর্শন’-এ প্রকাশ পেত। লিখতেন চন্দ্রনাথ বসু, দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখেরা। প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ ছিল ইতিহাস বিষয়ক। বহু ব্যবহারে জীর্ণ সেই উদ্ধৃতি — যা বঙ্কিমচন্দ্রের খেদ প্রকাশ করেছিল সাহেবরা পাখি মারতে গেলে তারও ইতিহাস লেখা হয়, বাংলার ইতিহাস নেই — এই প্রবন্ধের অংশ। ‘বঙ্গদর্শন’-এ প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ লেখা নিজের নামে ছাপা হয়নি। ‘বিষবৃক্ষ’, ‘ইন্দির’, ‘চন্দ্রশেখর’, ‘যুগলাঙ্গুরিয়’, ‘রজনী’, ‘রাধারাণী’, ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ — উপন্যাসগুলি এবং ‘মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত’, ‘কমলাকান্তের দপ্তর’, ‘লোকরহস্য’, ‘বিজ্ঞানরহস্য’ প্রভৃতি রচনা ‘বঙ্গদর্শন’-এ প্রকাশ পেয়েছিল। ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাস ও ‘বন্দে মাতরম’ স্তোত্র এখানেই প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বর্ষ থেকে বুক রিভিউ শুরু হয়। নিজে হাতে বঙ্কিমচন্দ্র সব লেখা সংশোধন ও সম্পাদনা করতেন। নিঃস্ব কৃষকদের দুর্দশার কথা, বাবু সমাজের প্রতি ব্যঙ্গ (কমলাকান্তের কলম দিয়ে), আমাদের পরাধীনতার কারণ ও তার প্রতিকারের উপায় (‘ভারত কলঙ্ক’, ‘বাঙালীর বাহুবল’) — এই সব প্রবন্ধ ‘বঙ্গদর্শন’-এ প্রকাশ পেয়েছিল। ‘বঙ্গদর্শন’ নাম হলেও শুধু বাংলা নয় — একটি বৃহত্তর জাতির অঙ্গ হিসেবে বাঙালিকে জাগিয়ে তুলতে বন্ধপরিচর ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। শুধু বাংলার দিকে তাকিয়ে নয় বাংলাকে পর্যবেক্ষণ করে এবং বিশ্বের বিখ্যাত দার্শনিকদের বই পড়ে তাঁর যে ধারণা তৈরি হয়েছিল ‘বঙ্গদর্শন’ তারই ফল। নবপর্যায় ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশের কালে ‘বঙ্গদর্শন’ - এর নাম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য —

“এ কথা কেহ কেহ বলিবেন, এখন ত বঙ্গদর্শন একটা নামমাত্র। যিনি বঙ্গদর্শনের প্রাণ ছিলেন, তিনিই যখন বর্তমান নাই, তখন কোন মাসিকপত্রের পক্ষে ‘বঙ্গদর্শন’ নামও যাহা, অন্য নামও তাহাই। কিন্তু আমরা নামকে নামমাত্র মনে করি না। যে নামকে বঙ্কিমচন্দ্র গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, সে নামের মধ্যে সেই স্বর্গীয়-প্রতিভার একটি শক্তি বহিয়া গিয়াছে। সেই শক্তি এখনও বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্যের ব্যবহারে লাগিবে, সেই শক্তিকে আমরা বিনাশ হইতে দিতে পারি না।”^৪

পাশ্চাত্য শিক্ষা বঙ্গীয় সমাজে একটা গুরুতর বিপ্লব উপস্থিত করেছিল, দেশীয় সমাজ যখন দেখল যে পাশ্চাত্য সভ্যতা বর্জন বা উপেক্ষা করে চলা একেবারেই অসম্ভব, তখন ধীরে ধীরে প্রাচ্য আদর্শের সঙ্গে এর সমন্বয় সাধনের পথে হাঁটল দেশীয় সমাজ। এই পথেই ঘটল গোঁড়া হিন্দু সমাজের পরিবর্তন। পরিবর্তনের যাত্রা শুরু হয়েছিল সাধারণ শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, স্ত্রী শিক্ষা, সমাজে স্ত্রীলোকের অধিকার, বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ, জাতিভেদ, ধর্মসংস্কার, শাস্ত্রানুগত্য, স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন আচরণ, শিল্প, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়গুলি চর্চার মধ্য দিয়ে। ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমন্বয়বাদী বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত বিষয়গুলিকে এক সূত্রে বাঁধার চেষ্টা করলেন। তবে সতর্ক দৃষ্টি ছিল বাঙালি জাতিকে স্বতন্ত্রতায় ভূষিত করার। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙালিরা বাংলা ভাষায় নিজের কথা গুছিয়ে প্রকাশ করবেন, ততদিন বাঙালির উন্নতির সম্ভাবনা নেই। পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্য ও পাশ্চাত্য জাতিসমূহের বৈষয়িক উন্নতি দেখে একান্ত মুগ্ধ বাঙালিরা সেই সব বিষয়ের অনুকরণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। এই বহিমুখ বাঙালিকে অন্তর্মুখ করবার উৎকৃষ্টতর উপায় হয়েছিল ‘বঙ্গদর্শন’; আর এই পথেই শিক্ষিত বাঙালিকে আত্মভাষার অনুশীলন করতে উপদেশ দিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বাঙালি জাতি অস্তিত্ব সংকট পড়েছিল। ধাপে ধাপে বাঙালি জাতির মেরুদণ্ড সোজা করার শিক্ষার দিকেই বঙ্কিমচন্দ্রের বোঁক বেশি ছিল। দেশপ্রেম জাগানোর মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিকে একটি নিজস্ব সার্বভৌম শক্তির পরিবেশ দেওয়াই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। দেশ ও জাতি গঠনের জন্য তাঁকে বহু বিষয়ের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি দিতে হয়েছিল। এই দৃষ্টির সীমানা ছিল সারা বিশ্ব। প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়, সংস্কৃত সাহিত্য, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, সঙ্গীতশাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্র, তুলনামূলক সাহিত্য - ইত্যাদি বহু বিষয় তাঁর ভাবনা জগতের মধ্যে ছিল। এই সব ভাবনাগুলিকে বাস্তবায়নের পথে রূপ দিতে তিনি আনলেন যুক্তিবাদ, সঞ্চর করলেন দেশপ্ৰীতির আবেগ ও উদ্দীপনা — যার মূল উদ্দেশ্য জাতির জীবনে আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনা। এ প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন —

“বাঙ্গলা সাহিত্যে উহার কোন্ কাজ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ... আমি বলিব, তিনি সাহিত্য উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে আপন ঘরে ফিরিতে বলিয়াছেন এবং সে বিষয়ে তিনি যেমন কৃতকার্য হইয়াছেন, অন্য কেহই সেরূপ হয় নাই।”^৫

প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র ‘বঙ্গদর্শন’-এর মাধ্যমে বাঙালিকে ঘরে ফিরতেই বলেছেন, কিন্তু চক্ষু কর্ণ ডানায় ঢেকে মূঢ় নিশ্চিততায় সমাহিত হতে বলেননি। দেশপ্ৰীতি তাঁর কাছে শুকনো কর্তব্য নয়, স্বদেশপ্রেম তাঁর কাছে ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম। ‘ধর্মতত্ত্ব’ - এ লিখেছেন –

“...আরো বুঝিয়াছি, আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধর্ম, স্বজন রক্ষা হইতে দেশরক্ষা গুরুতর ধর্ম। যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন, দেশপ্ৰীতি সর্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম।”^৬

সমস্ত চিন্তা দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দেশের লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত, অর্ধনগ্ন, মেরুদণ্ডহীন নর-নারীর বাস্তব হৃদয় বিদারক দশা দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও বড় – ‘আমার দুর্গোৎসব’-এ মা দুর্গাকে গৃহে ফিরে আসতে বললেন কমলাকান্ত। দেশই মা, দেশই স্বর্গ, দেশই ধর্ম, দেশই দেবতা, দেশই হল জ্ঞান, ভক্তি, ধর্ম, প্রাণ, হৃদয় ও শক্তি। যে মানুষ দেশকে, মাকে স্বর্গের থেকে বড় মনে করতে পারে না সে মানুষ বঙ্কিমচন্দ্রের মতে হতভাগ্য এবং সেই জাতিও হতভাগ্য যে জন্মভূমিকে স্বর্গের থেকে গুরুত্বের মনে করতে পারে না। তাঁর এই ভাবনা জাত ‘আনন্দমঠ’ বিশ্বের সামনে এক নতুন দর্শন ও আদর্শবাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। ড রমেশচন্দ্র মজুমদার যথার্থই বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ‘Patriotism’-কে ‘religion’-এ এবং ‘religion’-কে ‘Patriotism’ -এ বদলে দিয়েছিলেন। দেশপ্ৰীতি ও সার্বলৌকিক প্রীতি-এ দুইয়ের সামঞ্জস্য ও অনুশীলন ভারতবর্ষকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির পরিচয় দেবে বলে তাঁর প্রত্যয় জন্মেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের সন্ধানী চোখ। এই চোখে সাহিত্যের কয়েকটি প্রকরণের মধ্য দিয়ে ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকাকে বাহন করে বিশেষত সামান্য কিছু কবিতা, উপন্যাস এবং সর্বোপরি প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে সাহিত্যরস সৃষ্টি করে কল্যাণ বোধের পথ দেখিয়েছেন কমলাকান্তরূপী বঙ্কিম। আন্তরিকতাহীন স্বদেশপ্ৰীতির প্রতি তাঁর ছিল তীব্র কটাক্ষ। এই তীব্র দেশপ্রেম বর্ষিত হয়েছে তাঁর প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে। পতিত মানবজমিনকে আবাদ করে তোলায় কাজে ব্রতী হলেন তিনি; শুরু হল ‘লোকরহস্য’ উদ্ঘাটন। ‘লোকরহস্য’ উদ্ঘাটনের দুটি স্থূল গোত্র –

১. দেশীয় লোকসাধারণ

২. ইংরেজ

অর্থাৎ কখনো বাঙালি (বাবু গোত্রীয়), কখনো ইংরেজ। বঙ্কিমচন্দ্র ‘ইংরেজস্তোত্র’ প্রবন্ধে ব্যঙ্গস্তুতি করে ইংরেজকে আঘাত হেনেছেন তীব্র বাক্যবাণে। আবার ‘বাবু’ প্রবন্ধে বাঙালির অন্তসারশূন্যতাকে কষাঘাত করেছেন মিষ্টির মোড়কে তেতো ওষুধ প্রদান করে। ‘সাম্য’ প্রবন্ধে বহুপ্রকার বৈষম্যের যুক্তিপূর্ণ মতামত দিয়েছেন তিনি। ‘মনুষ্যফল’ প্রবন্ধেও মেকি দেশহিতৈষী বাঙালিদের বিদ্ধ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের মতে – পরার্থে আত্মবিসর্জনেই সুখ। সংযমের মাধ্যমে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলনের আবেদন করেছেন তিনি। তাঁর কমলাকান্তের আক্ষেপ –

“যাহা চাই তাহা মিলিল কই? এক জাতীয়ত্ব মিলিল কই?”^৭

কমলাকান্তের স্পষ্ট কথা –

“তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন?”^৮

বাঙালির বাহুবল যে আছে একথা প্রমাণ করতেও তিনি ছাড়েননি। পরাধীন দেশের হৃত গৌরব উদ্ধারের জন্য ‘কৃষ্ণচরিত্র’-এর মধ্যে নায়কের সন্ধান করেছেন। ‘বিড়াল’ প্রবন্ধে সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদের মাধ্যমে বঞ্চিতদের অভিযোগ ও দাবি তুলে ধরেছেন। আবার ‘আমার দুর্গোৎসব’ প্রবন্ধে দেশমাতৃকাকে তিনি ডাকলেন কমলাকান্তের কণ্ঠে —

“আমি নিতান্ত একা ... মাতৃহীন — মা! মা! করিয়া ডাকিতেছি। ... কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধান আসিয়াছি। কোথা মা! কই আমার মা? ... এসো মা, গৃহে এসো — যাঁহার ছয় কোটি সন্তান — তাঁহার ভাবনা কি? ... ভয় কি? না হয় ডুববি; মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?”^৯

‘ধর্মতত্ত্ব’-এ বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন — জাতীয় ধর্মের পুনরুজ্জীবন ছাড়া ভারতবর্ষের মঙ্গল নেই। সেই উদ্দেশ্যেই ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা দিলেন। নানা ধর্মাবলম্বীর দেশ ভারতবর্ষের অসাম্প্রদায়িক, সার্বভৌম ও সর্বজনীন ধর্মের ধারণা গড়ে দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর মতে — ‘বেদ’-এ ধর্ম নেই, ধর্ম আছে লোকহিতে। ধর্মের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, রাজনৈতিক উন্নতির মূলেও আছে ধর্মের উন্নতি; সকলকে ধর্মের উন্নতিতে মন দিতে নির্দেশ দিয়েছেন ‘কৃষ্ণচরিত্র’ গ্রন্থে। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক নবজাগরণের হাত ধরেই রাজনৈতিক বিপ্লবগুলি সংঘটিত হয়েছিল। ঠিক একই সূত্রে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্ম এবং জাতীয় আন্দোলনের প্রসার। এই পথেই ‘আনন্দমঠ’ এবং ‘জাতীয় কংগ্রেস’-এর প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫)।

প্রাচীন ভারতের ধর্মতত্ত্বকে অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্র যে নতুন ধর্মের কথা বলেছিলেন — তার মূলে ছিল দেশপ্ৰীতি। তাঁর আগে স্বদেশপ্ৰীতিকে এত বড় করে স্থান দেওয়ার কথা কেউ ভাবেননি। ‘একটি গীত’-এ বঙ্কিমচন্দ্রের সূত্রী অনুভূতি গীতিকাব্যের ভাষায়, দেশপ্রেমের সুরে বেজে উঠেছে। এছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালি জীবনে সূক্ষ্মশিল্পের অনাদর লক্ষ্য করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন —

“কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং চিত্র এই ছয়টি সৌন্দর্যজনিকা বিদ্যা। এই ছয়টি বিদ্যায় মনুষ্যজীবন ভূষিত ও সুখময় করে। ভাগ্যহীন বাঙ্গালির কপালে এ সুখ নাই। সূক্ষ্ম শিল্পের সঙ্গে তাহার বড় বিরোধ। তাহাতে বাঙ্গালির বড় অনাদর, বড় ঘৃণা।”^{১০}

সঙ্গীতবিদ্যা উপলক্ষ্যে ‘বঙ্গদর্শন’-এ বঙ্কিমচন্দ্র অনেক সারকথা বলেছেন। শিক্ষিত বাঙালি দেশীয় সংস্কারকে ঘৃণা করেছিল, দেশীয় সঙ্গীত তার অন্যতম। পাশ্চাত্য অনুকরণপ্রিয় বাঙালির সঙ্গীত প্রিয়তার প্রতি তীব্র কটাক্ষ (‘বাবু’ প্রবন্ধে) করেছেন। পক্ষান্তরে সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রাচীনগণের সূক্ষ্মদর্শিতা ও নিপুণ রসজ্ঞতা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। বাঙালিকে শিল্পতত্ত্ব এবং সঙ্গীত-রুচিতে নতুন করে দীক্ষা দিতে ‘বঙ্গদর্শন’-ই পথ প্রদর্শক হয়েছিল। ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় এরূপ বহু বিচিত্র বিষয়ের মধ্য দিয়ে স্বদেশ প্রেমের সুর বেঁধে দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র — এগুলি ‘বঙ্গদর্শন’-এর স্মরণীয় দান। শুধু প্রবন্ধ সাহিত্য নয়, ‘বঙ্গদর্শন’-এ প্রকাশিত বেশ কিছু উপন্যাসে আমরা পাই ইংরেজ বিদেষ, সমাজ সংস্কার, দেশ গঠনের জন্য নীতি নৈতিকতা বিষয়গুলি। ‘মৃগালিনী’ উপন্যাসে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ দেখা গিয়েছে। ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের ‘বন্দে মাতরম’ ধ্বনি স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা আপামর ভারতবাসীর মনে যে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছিল তা আজও অমলিন। এই পথে দেশাত্মবোধের উদ্বোধন হল এবং মাতৃ ভাষার দ্বার খুলে গেল, মণিজাল পূর্ণ খনির সন্ধান এগিয়ে গেল সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে দেশের মানুষ।

বহরমপুর থাকাকালীন ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার জন্ম। এই পত্রিকার জন্মলগ্নেই সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র পেয়েছিলেন তাঁর পত্রিকায় লেখার মতো বেশ কয়েকজন সাহিত্যিককে। এঁদের সাহচর্য পত্রিকার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ রচনা করে তাঁকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছিল। বহরমপুরেই থাকতেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন, লালবিহারী দে, রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, লোহারাম শিরোরত্ন, গঙ্গাচরণ সরকার, অক্ষয় সরকার, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, তারাপদ চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। এছাড়াও বিভিন্ন ভাবে বঙ্কিমচন্দ্র পাশে পেলেন — হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশনাথ রায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রমুখ শুভাকাঙ্ক্ষীদের। উক্ত

প্রতিভাধরেরা প্রত্যেকেই ছিলেন বিভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিত। সুতরাং 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মাধ্যমে তিনি যে ধরনের ফসল ফলাতে চাইছিলেন তাঁর সেই চেষ্টা অনেকটাই পূর্ণ হয়েছিল।

সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির কারিগর। যে চার বছর তিনি 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদক ছিলেন সেই চার বছরে একটি লেখক গোষ্ঠী তৈরি করে দিয়েছিলেন, যাঁদের প্রেরণা ও চিন্তা পদ্ধতি ছিল ঐক্যবদ্ধ দেশ গঠনের অনুকূল। বঙ্কিমচন্দ্রকে দায়িত্ব নিতে হয়েছিল নতুনতর দৃষ্টি, নতুনতর ভাবনাকে গড়ে দেওয়া, ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্যের সঙ্গে যোগ রেখে নতুন পথ তৈরি করে দেওয়ার। চিন্তানায়কের মতো সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে অন্যান্য লেখকদের রচনাকে যথার্থ পথে চালিত করা, দেশ ও জাতি সম্বন্ধে সচেতনতা এবং আত্মমর্যাদা বোধে উদ্দীপ্ত করা ছিল 'বঙ্গদর্শন' তথা বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য। ইংরেজদের লেখা ইতিহাস অনুসরণ না করে তিনি নিজে এবং ইতিহাস বোদ্ধাদের দিয়ে ইতিহাস চর্চা করার জন্য অনেক খ্যাতিমান লেখকদের আহ্বান করলেন 'বঙ্গদর্শন'-এ। কাকে দিয়ে কোন্ বিষয়টি লেখাবেন তা ছিল তাঁর পরিকল্পনা মাফিক। অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য তৈরি হল এক লেখক গোষ্ঠী। হেমচন্দ্র কবিতাই লিখতেন কিন্তু 'বঙ্গদর্শন'-এ লিখলেন প্রবন্ধ ('মনুষ্য জাতির মহত্ত্ব কিসে হয়')। রামদাস সেন কবি হয়েও লিখলেন প্রাচীন ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিষয়টিও প্রায় কাছাকাছি ছিল। দীনবন্ধু মিত্র নাট্যকার হয়েও 'বঙ্গদর্শন'-এর স্বার্থে লিখলেন কবিতা 'প্রভাত' আর গদ্যে লিখলেন 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ'। অক্ষয়চন্দ্র সরকার বঙ্কিমচন্দ্রের আবিষ্কার — তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'উদ্দীপনা' ছিল যুক্তিবদ্ধ, তথ্যমূলক রচনা যা আজও এক বিশেষ শ্রেণির রচনা হিসেবে খ্যাত। দর্শনের ছাত্র রাজকৃষ্ণ রূপক কাব্যের কবি হয়েও 'বঙ্গদর্শন'-এর জন্য প্রবন্ধ লিখলেন ইংরেজিতে। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল এবং স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের চিন্তা মূলক লেখাগুলি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশ করে কালান্তরের যোগসূত্র স্থাপন করলেন। এঁদের লেখাই ছিল পরবর্তী কালের বিপ্লবীদের ভাব উৎস। তাঁরা হয়ে উঠলেন জাতীয়তাবাদের পূজারী। 'বঙ্গদর্শন'-এর গ্রহণযোগ্যতাও বেড়ে গিয়েছিল — এই সব রচনাগুলি প্রকাশের সুবাদে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে যে জাতীয়তাবোধের প্রকাশ ঘটেছিল তা তাঁর জন্মভূমির পরাধীনতার বেদনা সঞ্জাত। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য অসি বাদ দিয়ে মসি তুলে নিয়েছিলেন তিনি। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা ছিল তাঁর যুদ্ধক্ষেত্র। কোন্ পথে দেশ, জাতি উঠে দাঁড়াতে পারবে সেই কঠিন পথগুলিতে অনায়াসে বিচরণ করে বাংলা পত্রিকার জগতে এক এবং অদ্বিতীয় পত্রিকার জন্ম দিয়েছিলেন তিনি। ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানকে স্বদেশের বোধগম্য করে তোলার দায়িত্ব নিলেন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মাধ্যমে — একাই। স্বদেশীয় চেতনার নব উদ্বোধন ঘটল এই ভাবে। বাংলা গদ্য ভাষা হীনমন্যতা কাটিয়ে পূর্ণ রূপ পেল, 'নির্গুণ স্বজন শ্রেয়' প্রতিষ্ঠিত হল। বাঙালি জাতির চিত্ত শুদ্ধির পথ খানিকটা প্রশস্ত হল। দেশবাসীর মনে দেশ সম্পর্কে অতীত গৌরব বোধ জাগ্রত করে দেশবাসীকে স্বাবলম্বন ও আত্মবিশ্বাসের শিক্ষাদান, প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা, জন্মভূমিকে ভক্তি করা, ভালোবাসা — এসব কিছুই এক পথে এসে দাঁড়াল। এই ক্ষেত্রে তিনি আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা, সে মন্ত্র 'বন্দে মারতম'। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 'ভারতের নব জাতীয়তার ঋষি' বা হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'The Real Father of Indian Nationalism' অভিধায় ভূষিত বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর দেশপ্রেমমূলক সৃষ্টি ও কর্মপ্রয়াস দেশের অখণ্ডতা, দেশপ্রেমের সম্যক ধারণাকে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছিল। সং সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে দেশসেবার সঙ্গে সাহিত্য পাঠের আকর্ষণও বেড়ে গিয়েছিল। আজ এই পত্রিকার সার্থশতবর্ষ অতিক্রান্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের দেখানো পথে আমরা আজ কতদূর এগিয়েছি? তিনি নানা পথের সন্ধান দিলেও আমরা কি আজ পথ হারিয়েছি? আজ স্বাধীনতার ৭৭ বছর পার করে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমরা। বঙ্কিমচন্দ্রকে যথার্থ ভাবে মূল্যায়ন করতে ভুলও করেছি বারবার। সঠিক ভাবে তিনি আমাদের কাছে পৌঁছেও পৌঁছাননি — আজ সময় এসেছে তাই বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার পুনর্মূল্যায়নের।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম রচনাবলী দ্বিতীয় খন্ড, সমগ্র সাহিত্য, বিবিধ প্রবন্ধ, বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা - ৯, প্রথম প্রকাশ দোল পূর্ণিমা ১৩৬১, অষ্টাদশ মুদ্রণ : আশ্বিন ১৪২৩, পৃ. ২৯১
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষা, ছাত্র সম্ভাষণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ -১৩১৫, পুনরমুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯ : ১৯০৪ শক, পৃ. ২৫৩
৩. সরকার, বিজলি (সম্পা), রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র, কাঁঠালপাড়া, নৈহাটি, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৪১৫, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ১৬২
৪. তদেব, নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, পৃ. ১৬৩
৫. দত্ত, ভবতোষ, বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময়ে, দীপ প্রকাশন ২০৯ এ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০৯, পৃ. ১৭
৬. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম রচনাবলী দ্বিতীয় খন্ড, সমগ্র সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব — স্বদেশপ্রীতি, চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়, সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা- ৯, দোল পূর্ণিমা ১৩৬১, অষ্টাদশ মুদ্রণ : আশ্বিন ১৪২৩, পৃ. ৫৯৮
৭. তদেব, কমলাকান্ত, দ্বাদশ সংখ্যা - একটি গীত, পৃ. ৭৫
৮. তদেব, বঙ্গদেশের কৃষক, প্রথম প্রবন্ধ - দেশের শ্রীবৃদ্ধি, পৃ. ২৫০
৯. তদেব, কমলাকান্ত, একাদশ সংখ্যা - আমার দুর্গোৎসব, পৃ. ৭১-৭২
১০. তদেব, বিবিধ প্রবন্ধ, আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প, পৃ. ১৭০

Bibliography:

- বঙ্কিম-সরণী, প্রমথনাথ বিশী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩
- বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময়ে, ভবতোষ দত্ত, দীপ প্রকাশন, ২০৯ এ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০৯
- বঙ্কিম সৃষ্টি সমীক্ষা, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩
- রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, সম্পাদনা-বিজলি সরকার, বঙ্কিম-ভবন গবেষণাকেন্দ্র, নৈহাটি।
- বঙ্কিম-মনীষা, অলোক রায়, এবং মুশায়েরা, ১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
- বিষয় বাংলা সাময়িক পত্র (নির্বাচিত), শম্পা চৌধুরী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯
- বঙ্কিমচন্দ্র সমাজভাবনা ও জীবনজিজ্ঞাসা, উত্তরা রায়, রেনেসাঁ পাবলিকেশন, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১২
- পশ্চিমবঙ্গ, বঙ্কিম সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ১৪০২
- নবপর্যায় জিজ্ঞাসা, বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ সংখ্যা, প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা চতুর্বিংশ বর্ষ, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: শিবনারায়ণ রায়।
- ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্র, সুমনকুমার মিত্র, 24 Aug, 2021, SPMRE www.spmf.org.
- বঙ্গদর্শন - Modern India [google.com/url?sa=t&source=web](https://www.google.com/url?sa=t&source=web)